বিবেক বিচিত্র

রমেন্দ্র নারায়ণ দে

কত অজানারে

এয়ারহস্টেস সিটটা দেখিয়ে দিল। ঢাউস প্লেনটার মাঝামাঝি জায়গায় জানালার পাশের তিনটে সিটের মাঝেরটা। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল দীপকের, জানালার পাশের সিটটা পেলে ভাল হত। সেই সিটটায় বসে আছেন বয়স্ক একজন মহিলা। ওভারহেড লাগেজবিনে ব্যাগপ্যাকটা রেখে নিজের সিটে বসতে বসতে দীপক খেয়াল করল মহিলার হাবেভাবে কোন আবাহন নেই। মুখ তুলে একবার তাকালেন বটে আগত সহযাত্রীর দিকে, কিন্তু সম্পূর্ণ উদাসীন চোখমুখ। বস্তুতঃ, দীপকের মনে হল মহিলার নাকের কোণায় কোথায় যেন ঈষৎ বিরক্তি থিতিয়ে আছে। বিশেষ ভাবল না এ নিয়ে, কারণ ওর মাথায় এখন কত কত চিন্তা। একদিকে বাবা মা ভাই বোন সবাইকে ছেড়ে দূর বিদেশে যাওয়া, অন্যদিকে সেই স্বপ্নের দেশের হাজার বিষয় অজানা। একটু আগে বাড়ির সবাইকে টা টা করেছে সিকিউরিটি এনক্লোজারের দরজা থেকে, বেশ ভারী হয়ে আছে মনটা। মার চোখমুখ শুকনো, বাবার উৎকণ্ঠা, রূপকের তরুণ চোখে আদর্শ দাদা, শিউলির চঞ্চল চাউনিতে দাদার গর্ব। মনের পর্দায় ধরে রাখা ছবি ক'টা নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখতে চাইল দীপক, কিন্তু অন্য চিন্তার প্রকোপে ঝাপসা হতে থাকে ছবিগুলো। জর্জিয়া টেক, প্রফেসর জনাথন বেইটস, আটলান্টা, আমেরিকা, এই সব নাম গুলোর সঙ্গে উপযুক্ত ছবিগুলো এখনো সঠিক জানে না দীপক। মানসপটে ধরা আছে কিছু ধারণা, কিন্তু বাস্তবে তা মিলবে তো? তাছাড়া চলতে থাকা জীবনের যে প্রতিচ্ছবিটা গাঁথা হচ্ছিল ভাবনার সরোবরে সেটায় পড়ল বড় একটি লোষ্ট্র। অজস্র ঢেউয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে সেই চিত্রটা। কী বিরাট একটা পরিবর্তন এসে গেল এই আমেরিকা যাবার ঘটনায়। গতকাল বাবা বলছিলেন কিছু কথা সে নিয়ে। বলছিলেন, ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেলে আজকাল বাবা মার সঙ্গে যোগাযোগ আর তেমন থাকে না। এখানের পরিবেশেই এই হাল, তারউপর এখন তুই যাচ্ছিস বাঁধন ভাঙার দেশে। জানি না তোকে আমরা আর ধরতে পারব কিনা। বাবার কথায় ভীষণ কষ্ট হয়েছিল দীপকের, কিন্তু বুঝেছিল এই শঙ্কার উত্তরে মৌখিক প্রবোধ মূল্যহীন, কার্মে প্রমান দেবার প্রয়োজন সৃষ্টি হল।

এখনো বোর্ডিং চলছে। পেসেঞ্জাররা আইল ধরে আসছে, ওভারহেড লাগেজবিনে ব্যাগ ইত্যাদি রাখছে, তারপর সিটে বসে সেটেল করার চেষ্টা করছে। সিটে সিটে দেয়া কম্বল বালিশ মোজার প্যাকেট এসব দেখে নিচ্ছে। সিটবেল্ট অ্যাডজাষ্ট করে নিচ্ছে যার যার মাপ মত। দীপকও ওর সিটবেল্টটা ঠিক করে নিল। কী বিশাল এই বোয়িং ৭৪৭ প্লেনগুলো, যেন পুরো একটা জগৎ পাখীর পেটে। দীপক এতক্ষণ খেয়াল করেনি, এখন দেখল ওর চোখের সামনে ছোট একটা টিভি স্ক্রিন। প্রত্যেকটা সিটের পিঠে এক একটা স্ক্রিন, পিছনের সারির প্রত্যেকটা সিটে বসা পেসেঞ্জারের চোখের সামনে। দীপক সেটাকে সুইচ অন করে কি কি আছে দেখছিল, মাঝবয়সি লোকটি ওর পাশের আইলসিটে ধপ্ করে ব্যাগটা রেখে বললেন, হাই।

চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল দীপক। দীর্ঘদেহী লোকটি ওভারহেড লাগেজবিনে একটা পুলঅন লাগেজ রাখছেন। গলা থেকে দুপাশে ঝুলছে দুটো ক্যামেরা, একটা ষ্টিল ক্যামেরা, অন্যটা কেমকর্ডার। তার মাঝখানে আবার একটা ওয়াটার বটল। দীপক খেয়াল করল ভদ্রলোক কেবল লম্বা না, সুস্বাস্থ্যের অধিকারীও বটে। অ্যাথলেটিক চেহারা। হাফহাতা সার্ট পরেছেন বলে পেশিবহুল বাইসেফ দেখা যাচ্ছে। বেশ সুপুরুষ। বোর্ড করতে একটু দেরী করে ফেলেছেন তাই ভর্তি লাগেজবিনে জায়গার অসুবিধা হচ্ছে। পুলঅন লাগেজটা রাখবার পর ডাফলব্যাগটা ঠেলেঠুলে ঢোকাতে চেষ্টা করছেন। এয়ারহস্টেস এসে গেল অসুবিধায় পড়া পেসেঞ্জারকে সাহায্য করতে। বলল, লুকস লাইক দেয়ার'জ নো রুম ফর দ্য লার্জ ব্যাগ হিয়ার।

ততক্ষণে তিনি লাগেজটা ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন গর্তে। লাগেজবিনের দরজাটা খটাস করে বন্ধ করে বললেন, ম্যানেজড ঈট অ'রাইট।

ঔ ক্কে।

সহযাত্রী–১

এয়ারহস্টেস চলে গেল। দীপক খেয়াল করল লোকটির ইংরাজী উচ্চারণ এক্কেবারে বিদেশিদের মত। বাদামী চামড়ার লোকের মুখে এ রকম চোস্ত ইংরাজী ও আর একবারই শুনেছিল, বার্কলের প্রফেসর নরেশ সাক্সেনা যখন ওদের ডিপার্টমেন্টে সেমিনার দিয়েছিলেন দু বছর আগে। সুপুরুষ ঝরঝরে ইংরাজী বলা সহযাত্রী ধপ্ করে সিটে বসে ক্যামেরাগুলো সামলাতে সামলাতে দীপককে বললেন, আ'ম বিবি, বিল ব্যানার্জী।

নামটাও বিদেশি, যদিও পদবী বাঙালি। দীপক বলল, মাই নেম ইজ দীপক সিনহা।

বাঙালি?

হ্যাঁ।

গুড, আমিও।

আপনার সারনেম থেকে তা মনে হচ্ছিল, তবে বিল তো . . . .

হা হা হা করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক, চেহারা অনুপাতিক হাসিও উচ্চ স্বরগ্রামে। বললেন, আমার আসল নাম বলরাম ব্যানার্জী, সেই থেকে বিল, ইন শর্ট বিবি।

দীপক বুঝল বলরাম বিদেশে গিয়ে বিল হয়ে গেছে। ভাবছিল এই বিবি থাকেন কোথায়? বিলেত না আমেরিকা? বৃটিশ এয়ারওয়েজের এই ফ্লাইটটা লন্ডনে শেষ হয়ে যাবে, অনেকের গন্তব্য সেই পর্যন্ত। ওর মত অনেকে আবার আরো যাবে, পরের কানেকটিং ফ্লাইট ধরে আটলান্টিকের ওপাড়ে আমেরিকায়। যেন দীপকের ভাবনা বুঝেই উনি বললেন, নিউ জার্সি। সেখানে ব্রিজওয়াটার বলে একটা শহরে আমি থাকি।

আমেরিকা। আমিও তাই ভাবছিলাম।

তুমি কোথায় যাচ্ছো? তুমি বলে ফেললাম, ইউ'র লাইক অ্য ইয়াংগার ব্রাদার।

অফকোর্স, দীপক তাড়াতাড়ি বলল, আপনি আমার দাদার মতন বটেই। আমি যাচ্ছি আটলান্টা। জর্জিয়া টেকে পি এইচ ডি প্রোগ্রাম।

ষ্টুডেন্ট?

হ্যাঁ।

হুঁ, আজকাল তো অ্যামেরিকা পড়তে আসা জলভাত হয়ে গেছে। বাপের কিছু টাকা খসাবে, এই তো?

না, মানে, আমার বাবার অত টাকা নেই।

ও। তো এখানে লোন করেছো, নাকি ওখানে ইউনিভার্সিটি টাকাপয়সা কিছু দিচ্ছে?

দিচ্ছে। তা নইলে তো যাওয়া সম্ভবই হত না।

হুঁ, মনে হচ্ছে উদোম ভালছাত্র তুমি। আজকাল তো স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে আসা পাবলিক অ্য রেয়ার স্পিসিচ।

না না, তেমন কিছু না, দীপক লজ্জা পেল। তারপর সম্ভাব্য সমস্যার ভাবনায় বলল, কিন্তু ইউনিভার্সিটি যা দেবে সেটা যথেষ্ট হবে কিনা আমি জানি না।

দ্যাটস ঔ ক্কে, চলে যাবে ঠিক। উই ইন্ডিয়ান্স ক্যান ম্যানেজ উইথ হয়াটেভার উই গেট।

আমাকে ম্যানেজ করতেই হবে, দীপক মনের জোর দেখাল।

বাই দ্য ওয়ে, বিবি মুচকি হেসে বললেন, জায়গাটার নাম বলবে এটল্যান্টা, আটলান্টা না। আর সারনেম কথাটা অ্যমেরিকায় ইউজ হয় না, বলবে লাষ্টনেইম।

জানি আমার প্রনান্সিয়েসন্স আর ইউজ অফ টার্মস এ অনেক ভুল আছে।

ভুল না, এমন ভাববে না। ঈটস জাষ্ট ডিফারেন্ট ওভার দেয়ার। অ্যান্ড ইউ নৌ, হ্যাভ টু বী অ্য রোমান হোয়াইল ইন রোম।

চিত্র এক

প্লেনের অডিয়ো সিষ্টেমে ঘোষণা এল, ‘ফ্লাইট ইজ রেডী টু টেইক অফ।’ বিশাল ধাতব পাখীটা নড়ে উঠল। দীপক খেয়াল করল ইঞ্জিনের শব্দও বেড়ে গেছে অনেকগুণ। সিট বেল্ট বাঁধতে হবে, সিট আপরাইট পজিশনে আনতে হবে। সম্ভাবনা প্রায় নেই, তবুও দুর্ঘটনায় কি কি করতে হবে তা দেখানো হবে সামনের টিভি স্ক্রিনে, ঘোষণা চলতে থাকল। এয়ারহষ্টেসরা ঘুরে ঘুরে দেখে যাচ্ছে সবাই সিটবেল্ট বেঁধেছে কিনা, সিট সোজা আছে কিনা। এই সব ইম্পর্ট্যান্ট ডেমোনষ্ট্রেশনের সময় অমনোযোগী হওয়া ঠিক না, কিন্তু দীপকের মন চলে গেল অন্য ভাবনায়। মার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের ছবিটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়, তারপর শিউলির হাসিমুখটা, রূপকের চোখে স্বপ্ন, বাবার কপালে কত ভাঁজ। প্লেনটা রানওয়ের দিকে এগোচ্ছে। দীপক ঝুকে পড়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে গেল যদি বাড়ির লোকেদের দেখা যায়। পরমুহূর্তেই খেয়াল হল এখন তো মাঝরাত, বাইরে ঘন অন্ধকার। জানালার ধারের সিটে বসা মহিলা বিরক্ত হলেন। প্রায় ধমকে উঠলেন, এই অন্ধকারে কী দেখবে? গায়ের উপরে উঠে এলে এক্কেবারে!

স্যরি, দীপক সরে এসেছে বলার আগেই। বলল, প্লিজ কিছু মনে করবেন না।

রানওয়েতে এসে তীব্র গতিতে দৌড়াতে লাগল প্লেনটা, স্পীড ফর টেইক অফ। ছোট প্লেনে আগে চড়েছে দীপক, কিন্তু এমন বৃহৎ ভারের উত্থানগতির অভিজ্ঞতা আলাদা। জানালা দিয়ে যে টুকু দেখা গেল, তাতে দূরের মাটিতে কলকাতার ছোট ছোট আলোগুলো পিছনে চলে গেল যেন নিমেষে। কলকাতা পিছনে ফেলে ও চলেছে স্বপ্নের দেশে। শেষপর্যন্ত সফল হতে চলেছে ওর উচ্চাশা, উত্তেজনায় ফুরফুর করে উড়ে উঠে ওর মনটা। পরমুহূর্তেই হয়ে যায় ভারী, খুব ভারী। পিছেনে ফেলে যাচ্ছে কত কিছু, মা বাবা ভাইবোন আত্মিয়স্বজন বন্ধুবান্ধব, কলকাতা। মার ছলছলে দুটো চোখ। বলেছিল, সাবধানে থাকিস বাবা, ফোন করিস।

বাড়ির লোকেদের জন্যে খুব মন কেমন করছে বুঝি? বিবির প্রশ্ন।

একমনে ভাবনার মধ্যে বিবির হঠাৎ প্রশ্নে একটু চমকে উঠল দীপক। চট করে কোন কথা আসছে না মুখে, যেন জড়িয়ে থাকা ভাবনা থেকে ছিঁড়ে আনতে পারছে না নিজেকে। এই প্লেন ভর্তি এত লোকের সব্বাই তো ছেড়ে যাচ্ছে কোন না কোন আপনজনকে, সবার কি ওরই মত মন কেমন করছে? বিবির প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দীপক পাল্টা প্রশ্ন করল, আপনার মনখারাপ লাগছে না বাড়ির লোকেদের জন্য?

অন্যবার লাগে না, তবে এবার লাগছে।

আপনি অনেকবার যাতায়াত করেছেন, না?

বাইশ বছর বাইরে। তা দশ বারোবার গেছি এসছি তো বটেই। প্রথমদিকে তোমার মত হত, তারপর কমে গেছে।

এবার মনখারাপ লাগছে কেন?

কোন উত্তর দিলেন না বিবি, কী যেন ভাবছেন। দীপকের মনে হল উনি এ নিয়ে আর কথা বলতে চান না। চোখের সামনের টিভি স্ক্রিনে মনোনিবেশ করতে যাচ্ছিল, বিবি বললেন, বিয়ে করেছি বুঝলে। বৌয়ের ভিসা হল না বলে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারছি না। ভালো লাগছে না।

ব্বা! বিয়ে করেছেন এত্তদিনে! মনে মনে ভাবল দীপক, এঁর বিয়ে করা উচিৎ ছিল কম করে আরো দশ বছর আগে। মুখে বলল, আমেরিকার ভিসা পাওয়া একটা কঠিন সমস্যা। কী ঝামেলা গেছে আমার!

না না, আমার তেমন ঝামেলা নেই, বিবি মাথা নাড়ালেন, আমি তো অ্যমেরিকান সিটিজেন। তবে প্রসেসিং টাইম তো লাগবেই।

তা ঠিক, আপনি তো অনেক দিন হল ওদেশে আছেন।

হুঁ, অনেকদিন। বললাম তো বা-ই-শ বছর। একটু চুপ করে থেকে ফের বললেন, কত কিছু ঘটে গেল এই বাইশ বছরে। গেছিলাম কেমিষ্ট্রি পড়তে, লাইন পাল্টে হয়ে গেলাম মার্কেটিং এর লোক।

লাইন পাল্টালেন কেন?

যাচ্ছোতো ওদেশে, সব বুঝতে পারবে।

কী বলবে দীপক, ওদেশের রকম সকম সত্যিই ও জানে না। বিবি আবার বললেন, সো ম্যানি থিংস হ্যাপেন্ড ইন দ্য ইয়ার্স আই'ভ বীন দেয়ার। অনেক চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে গেছি হে।

ও। সোজাসুজি প্রশ্ন করতে একটু বাঁধছিল দীপকের, তবুও জিজ্ঞাসা করে ফেলল, কি রকম চেঞ্জ?

অনেক। আমি দেশ থাকতে কোনদিন টেনিস খেলিনি, ওদেশে গিয়ে ওটাই আমার মোষ্ট ফেভারিট গেইম হয়ে গেল।

এ তো দেশ আর আমেরিকার মধ্যে সুযোগের তফাতের ব্যাপার, দীপক মানতে পারল না, এটাকে চেঞ্জ বলবেন কী?

প্রথমদিকে আমার হান্টিং দারুণ লাগত, আই হ্যাড ফোর ফাইভ গানস। আজকাল আমি ঘোরতর বন্দুক বিরোধী।

হান্টিং আপনার ভাল লাগত? গুলি করে মারা!

লাগত। তখন আমি মনেপ্রাণে অ্যমেরিকান হবার চেষ্টায় ছিলাম।

আমেরিকান হতে হলে বন্দুক ভাল লাগতে হবেই?

না, হবে না। সব অ্যমেরিকানের সেটা পছন্দও না। তখন অত তলিয়ে দেখিনি, বা দেখতে চাইনি। দৌজ ডেইজ, আই হ্যাড ড্রং কাইন্ড অভ অ্যাসোসিয়েশন।

মানে?

জানো, বছর দশেক আগে আমি একটি অ্যমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম।

ভাল চমক লাগল দীপকের। সময়মত বিয়ে বিবি তাহলে করেছিলেন। আমেরিকান মেয়ে! কী হল সে বিয়ের? ভেঙে গেছে নিশ্চয়ই, তা নইলে আবার বিয়ে করলেন কী করে। অনেক প্রশ্ন, অনেক কথা। টানা আট ঘন্টার উড়ানে খাওয়া দাওয়া টিভিতে সিনেমা দেখার ফাঁকে ফাঁকে সব কথাই হল। বিবি আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করে ভেবেছিলেন পুরোদস্তুর সাহেব হতে পেরেছেন। তখন তিনি নিত্যদিন মারিজোয়ানা টানেন, বীয়ার হুইস্কিতে ভাসেন, মোটা মোটা ষ্টেইক খান, বন্দুক চালিয়ে হরিণ মারেন

ফটাফট। কেমিস্ট্রিতে পয়সা নেই, চলে গেছেন লাম্বার বিজনেসে। শুনতে শুনতে দীপকের খুব রোমাঞ্চকর লাগে সব ঘটনা। বলল, বেশ এক্সাইটমেন্ট ছিল আপনার সে লাইফে।

ছিল, বিবিও মানেন। ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, তবে কী জান, কেমন যেন রেস্টলেস, কোন বিশ্রাম ছিল না। আর দিনে দিনে হাজারটা বিষয়ে স্যারার সঙ্গে মতের অমিল, পছন্দের গরমিল, তাল মেলানোর মুশকিল। আই গট টোট্যালি টায়ার্ড, টোট্যালি। তারপর একদিন আমি ছিটকে বেড়িয়ে এসেছিলাম রেডনেকদের দল ছেড়ে। আই স্টিল রিমেমবার দ্য সেন্স অভ ফ্রিডম আই গট দ্যাট ডে। ওফ, হোয়াট অ্যা রিলিফ! আই ওয়্যজ এবল টু ব্রীদ উইথ মাই ফুল লাংস এফটার অ্যা লং টাইম।

বিবি চুপ করে কী ভাবছেন। দীপক মনে মনে ভাবল মাইকেল মধুসূদনের মর্ডান ভার্সান। বিবি আবার বলতে শুরু করলেন, বুঝলে, আমার মনে হয়েছিল ম্যারেজ টাইজ ওয়ান আপ টুউ মাচ, দ্যাটস নট মাই কাপ অভ টী। আমি হতে চেয়েছিলাম ফ্রি বার্ড। বাঁধন মানি না, ঘর চাই না। অ্যামেরিকায় এমন কোন জঙ্গল নেই, যেখানে আমি যাইনি। তখন আমি রকি মাউন্টেন ক্লাইম্ব করেছি তরতর করে, কলোর‍্যাডো নদীতে র‍্যাফটিং করেছি একাধিকবার, গ্রান্ড ক্যানিয়ান ক্রস করেছি এবার ওপার।

ব্বাবা, আপনি কত কিছু করেছেন!

কিন্তু শেষপর্যন্ত ফিরতে হয়। একসময় মনে হল নিজেকে আমি যেন খুঁজে পাচ্ছি না। আমি কোথায়? কী করছি আমি? তারপর গ্রাজুয়্যালি আই গেদারর্ড মাইসেল্ফ। আই ফৌকাস্ড অন মাই কেরিয়ার। আবার স্কুলে গেলাম, আবিষ্কার করলাম মার্কেটিং ফিল্ডে আমার ইন্টারেস্ট অ্যান্ড অ্যাপটিটিউড।

খুব ইভেন্টফুল লাইফ আপনার, দীপক বেশ মোহিত। বলল, এরপর ধীরে সুস্থে বিয়ে করলেন আবার, না?

না। বিয়ে আমি আর করবই না ঠিক করেছিলাম।

তা হলে . . . .

এই বিয়ে করেছি মার চাপাচাপি আর ঠেলতে না পেরে।

মা তো আপনাকে সংসারী দেখতে চাইবেনই।

দ্যাটস রাইট।

বৌদি আপনার মার চয়েস, না আপনার?

মার, তবে আমি অপছন্দ করলে হত না। অল্প একটুক্ষণ কী ভেবে নিয়ে বিবি আবার বললেন, কী জান, আমার তো বয়স হয়ে গেল। যার সঙ্গে আমার এ বয়সে বিয়ে হতে পারে সে তো আর কম বয়সের কেউ না, শী'উল অলসো বী কোয়াইট ম্যাচিওরড। তার নিজস্ব মতামত, পারসোন্যালিটি, এসব ফর্ম করে গেছে। হার পারসোনাল অ্যান্ড প্রোফেশন্যাল লাইফ হ্যাজ অলরেডি টেইকেন সাম সেইপ। আই ওয়্যজ, অ্যান্ড স্টিল অ্যাম, ভেরী কনসার্নড।

বটেই তো। এসব ভাবনা তো উড়িয়ে দেয়া যায় না।

বল?

বৌদি কী কাজ করেন? মানে চাকুরে?

হ্যাঁ। ও সিমেন্সের পারসোনেল ম্যানেজারের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট।

বৌদিকে তো সব ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে ওদেশে।

তাতে ওর আপত্তি নেই। ওর ওর্য়াক এক্সপিরিয়েন্সের দৌলতে ওদেশে শী'উল বী এবল টু গেট স্যুটেবল যব উইদাউট মাচ ট্রাবল। ওটা তেমন সমস্যা হবে না। আমার চিন্তা কী জান?

কী?

আমার শুধু চিন্তা সব মিলিয়ি আমার সঙ্গে ওর বনবে কিনা। আমারো তো মত আছে হাজারটা। আমি জানি না আমাদের প্রপার আন্ডারষ্ট্যান্ডিং হবে কিনা।

কেমন যেন খুব ভাল লাগছে পুরো ব্যাপারটা দীপকের। বলল, দেখবেন ব্যানার্জীদা, এবার আপনার আর কোন ঝামেলা হবে না।

আমিও তাই ভাবি। ইনডীড, আই'ল ট্রাই মাই বেস্ট টু মেইক ঈট দিস টাইম।

কথায় কথায় সময় কেটে গেছে বেশ। অডিয়ো সিস্টেমে ঘোষণা হল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা লন্ডনের হীথরো এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করবে। বিবি বললেন, আমার কানেক্টিং ফ্লাইট একঘন্টার মধ্যেই, নেমেই দৌড়াতে হবে আমাকে।

ও . . . .

তোমার কানেক্টিং ফ্লাইট কতক্ষণ পর?

ছ'ঘন্টা।

নট ব্যাড, হাত পা ছাড়াতে পারবে একটু।

তা ঠিক। শুনেছি হীথরো এয়ারপোর্ট নাকি বেশ বড়।

তুমি শুধু ট্র্যানজিট লাউঞ্জে ঘুরে বেড়াতে পারবে, পুরো এয়ারপোর্টে না, বিবি বুঝিয়ে বললেন, বাট দ্যাট ঈটসেল্ফ ইজ কোয়াইট বিগ। লটস অভ ষ্টোর্স অ্যান্ড ষ্টাফ। অনেক ডিউটি ফ্রি জিনিস পাওয়া যায়। কিনতে পারবে অনেক কিছু।

হুঁ।

দীপক চুপ করে শোনে, কেনাকাটার পয়সা কোথায় পাবে ও। অনেক কষ্টে প্লেনের ভাড়া যোগার করেছে। হাতে যে কটা ডলার আছে তার ভরসায় নতুন জায়গায় নতুন জীবন শুরু করা। এসব ভাবনায় ওকে ম্রিয়মাণ দেখিয়েছে সম্ভবতঃ। বিবি বললেন, জানি আজেবাজে খরচ করার পয়সা এখন তোমার নেই। আই রিমেমবার মাই আরলি ডেইজ ইন অ্যামেরিকা।

দীপক মাথা নাড়িয়ে জানায় অবস্থা সেরকমই। বিবি আবার বললেন, তোমাকে একটা কথা বলছি দীপক, ইফ ইউ নীড অ্যানি হেল্প, ডোন্ট হেসিটেট টু কল মী।

বিবির কথা শুনে দীপকের মনটা অদ্ভুত একটা ভাললাগায় ভরে গেল। পথের সাথী এত বন্ধু হতে পারে! উপযাচক হয়ে সাহায্য করতে চাইছেন! সাহায্য নেবার আগেই চোখে এসে গেল কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি। সেদিকে তাকিয়ে বিবি পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করলেন। সেটা থেকে একটা কার্ড বের করে দীপকের হাতে দিয়ে বললেন, এতে আমার টেলিফোন নাম্বার আছে। অ্যানি হেল্প ইউ নীড, ইনক্লুডিং মানি, জাস্ট কল মী।

সহযাত্রী–২

হীথরো এয়ারপোর্টের ট্র্যানজিট লাউঞ্জটা সত্যিই বেশ বড়। অনেক দোকান, খাবার জায়গা, বসবার জায়গা, বাথরুম ইত্যাদি, প্যাসেঞ্জার অ্যাসিসষ্ট্যান্স বুথস, এডভারটাইজমেন্ট বোর্ডস এসব নিয়ে ঝলমল করছে পুরো লাউঞ্জটা, লোকে লোকারণ্য। বাথরুমে গিয়ে মুখধুয়ে চোখেমুখে জল দিয়ে বেশ ঝরঝরে লাগল দীপকের। তারপর হেঁটে হেঁটে সব দেখল। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে আধঘন্টার বেশি সময় লেগে যায়। মাঝখানে একটা অ্যাসিসষ্ট্যান্স বুথে দাঁড়িয়ে ওর কানেকটিং ফ্লাইটের ষ্টেটাস, গেট নাম্বার সব জেনে নিল। কত কিছু কিনতে লোভ হচ্ছে, কিন্তু পকেটে মাত্র ষাট ডলার। ডিউটি ফ্রি দোকানগুলোর পিছনে একটা নিড়িবিলি বসবার জায়গায় চলে এল দীপক। এখান থেকে রানওয়েটা দেখা যাচ্ছে। সুবিধামত একটা সিট খুঁজছিল কিছুক্ষণ বসবে বলে, হঠাৎ ডাক শুনতে পেল, এই যে, এই যে . . . .

বাংলা কথা শুনে ঘাড় ঘুড়িয়ে খুঁজল দীপক। প্লেনের সেই বয়স্ক মহিলা, ওপাশের একটা সিটে বসে আছেন, হাত তুলে ডাকছেন ওকে।

পায়ে পায়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল দীপক। উনি বললেন, তোমার নামটা মনে করতে পারছি না।

দীপক।

হ্যাঁ হ্যাঁ দীপক। বোসো না এখানে, উল্টো দিকের সিটটা দেখিয়ে বললেন।

চোখেমুখে আগের মত ইন্ডিফারেন্ট ভাবটা নেই, গলার স্বরেও নেই আগের রুক্ষতা। দীপক বসল, পায়ের কাছে মেঝেতে রাখল ব্যাগপ্যাকটা। উনি বললেন, মাঝখানের এই বসে থাকার সময়টা খুব বাজে, কাটতে চায় না।

কব্জির ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দীপক বলল, আড়াই ঘন্টাতো কাটিয়ে দিয়েছি হাঁটাহাঁটি করতে করতে, আরো সাড়ে তিন ঘন্টা বাকী। তবে ফ্লাইট টাইম এর কিছু আগে থেকে তো বোর্ডিং টোর্ডিং শুরু হয়ে যাবে।

তুমি তো শুনলাম আটলান্টায় যাচ্ছো।

হ্যাঁ। আপনিও কী....

না না, আমি যাচ্ছি হিউস্টন। আমার কানেকটিং ফ্লাইটের আর দেড় ঘন্টা বাকী।

বয়স্ক মহিলা একা এতবড় একটা জার্নি করছেন। মাঝে কানেকটিং ফ্লাইটের ঝামেলা থাকলেও ওঁর চোখেমুখে যে রকম রিলাক্সড ভাব, দীপক নিশ্চিত উনি এই রুটটাতে বেশ অভ্যস্ত। বলল, মনে হচ্ছে আপনি এই জার্নিটাতে বেশ সরোগরো। আগে অনেকবার যাতায়াত করেছেন?

এই নিয়ে পাঁচ বার হচ্ছে।

তাই আপনি অত কনফিডেন্ট। আপনার কে থাকে হিউস্টনে?

আমার মেয়ে।

মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন এত বার?

না। আমি আমার মেয়ের কাছেই থাকি।

কোন কথা ছাড়াই দীপক ভেবে নিল মহিলার কোন ছেলে নেই। বলল, তাহলে দেশে গিয়েছিলেন বেড়াতে, না? কে কে আছে দেশে?

আছে অনেকেই, ছেলে বৌ নাতি নাতনি। না, বেড়াতে আমি যাইনি দেশে। কলকাতার বাড়িটা ভাগাভাগির দলিলে সই না করে দিলে ছেলেদের ঝগড়ার সুরাহা হচ্ছিল না, মিটিয়ে এলাম সে ঝামেলা।

ও।

ছেলে তাহলে আছে মহিলার, দীপক ধারণার গরমিল শুধরে নিল মনে মনে। কিন্তু ছেলেদের কথায় মহিলার গলায় কেমন যেন বিদ্বেষ, তবে তা নিয়ে কথা বলা তো ঠিক দেখাবে না। মহিলা আবার বললেন, যেন দীপকের ভাবনার খেই ধরেই, ছেলেদের কাছে আমি থাকি না, সাত বছর হয়ে গেল।

আমেরিকা থাকতে বুঝি আপনার বেশি ভাললাগে?

বেশ খারাপই লাগতো প্রথম প্রথম, এখন সয়ে গেছে।

খারাপ লাগতো?

হ্যাঁ।

তাও থেকেছেন কেন?

কেন আবার, মহিলার চোখেমুখে বিরক্তি ভাব ফুটে উঠল, ছেলের বৌদের খিটখিটানি ত্যারাবেঁকা কথা আর সহ্য করতে পারছিলাম না। মেয়ে বলল চলে এস আমার কাছে।

ও।

বুঝলে, আজকাল সব ছেলেরাই এমন, মা থেকে বৌ তাদের কাছে বড়। বৌয়ের মেজাজের তোয়াজ করতেই ব্যস্ত, মা বাবাকে তোয়াক্কা করার সময় কই। একটু থেমে আবার বললেন, দেখলে না, তোমার ডানপাশে বসা লোকটা কী বলল।

কী বলল?

বলল না, বাড়ির লোকেদের জন্যে খারাপ লাগে না, খারাপ লাগছে বৌকে ফেলে যাচ্ছে বলে।

দীপকের মনে হল বিবির বক্তব্যটাকে অনেকটা ডিষ্টরটেড করে দেখছেন ইনি। বলল, বিবির কথা বলছেন? ওঁর ব্যাপারটা তো ঠিক তেমন না।

তেমন না তো কী?

মানে এত বছর ধরে বাইরে আছেন, বাড়ির লোকেদের থেকে দূরে থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে। রিসেন্টলি বিয়ে করেছেন যাকে তাকে ফেলে যেতে হচ্ছে বলে খারাপ লাগছে। উনি তো বললেন বিয়ে করেছেনই মার মন রাখতে।

হুঁ, ও রকম সবাই বলে। আমি জানি, এই বৌ আমেরিকায় চলে আসার পর মার খোঁজ আর থাকবে না।

চিত্র আরেক

দীপক নিশ্চিত এই মহিলা ছেলেদের কাছে থেকে, বৌদের কাছ থেকে বেশ দুর্ব্যবহার পেয়েছেন, যা ওঁর দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিয়েছে এ রকম। কিন্তু তবুও এ যেন খুব একপেশে, পরিস্থিতির পূর্ণ বিচার না। দীপক ভাবল এই নিয়ে তর্ক করতে গেলে মহিলা পছন্দ করবেন না। প্রসঙ্গ হাল্কা করার জন্য বলল, হতেও পারে, বিবির যেমন ঘটনা বহুল জীবন শুনলাম।

হতেও পারে না, হবেই, মহিলার গলায় বিষাদের প্রত্যয়, সব এক।

দীপক কী বলবে, ভাবল চুপ করে থেকে প্রসঙ্গটার পাশ কাটানো যাক। ছেলেদের ব্যবহারে উনি নিঃশ্চয়ই খুব মনোকষ্ট পেয়েছেন। দীপককে চুপ করে থাকতে দেখে উনি আবার বললেন, কী হল, কিছু বলছো না যে?

কী বলব, দীপক ভাবতে ভাবতে বলল, বিবি কী অন্যায় করেছেন আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না।

তুমি তো এমন বলবেই, তুমিও তো একটি ছেলে।

দীপক দেখল সমদোষে দোষী ও হয়ে গেছে। কেমন যেন মনে হল নিজের ছেলেদের সঙ্গে যে তর্কটা উনি করতে পারেননি, সেটা উনি করতে চাইছেন ওর সঙ্গে। ওদের পারিবারিক পরিস্থিতি দীপক জানে না, কিন্তু এই প্রসঙ্গে সাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ কিছু যুক্তি ওর অবশ্যই আছে। তাছাড়া এই মহিলার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই, পরিচয় নেই, তাই নেই কোন মনরাখার বাধ্যবাধকতা। মনে হয় সে জন্যেই মহিলাও ওর সঙ্গে এই নিয়ে তর্ক করতে পারছেন র্নিদ্বিধায়। দীপক বুঝতে পারল এরপর আলোচনাটা অপ্রিয়তায় চলে যাবে, কিন্তু মনে আসা কথা না বলে ও পারল না। জিজ্ঞাসা করল, আপনার জামাই, মানে হিউস্টনে মেয়ের বর, ওঁর মা বাবা নেই? ওঁরা কোথায় থাকেন?

বড় বড় চোখ করে উনি তাকালেন দীপকের দিকে। এমন প্রশ্ন আশা করেননি, কিন্তু এই প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। দীপক বুঝতে পারে না উনি কথার উদ্দেশ্যটা ধরতে পারছেন কিনা। খোলসা করে বলতে যাচ্ছিল বক্তব্যটা, তার মধ্যেই চোখের পলক ফেলে উনি মুখ খুললেন। ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, সোজা না বলেও বলে দিতে পার খোঁচার কথাটা।

একটু ইতস্ততঃ করে দীপক বলল, সব মার মেয়েই তো আরেক মার ছেলের বৌ। সমালোচনা কি বিচার, সমানে সমানে হয় কী?

না, হয় না। বাস্তবে যা হচ্ছে তাতে সমান বিচার সম্ভব না। যার কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় তার পক্ষে না গিয়ে মানুষ পারে না। বুড়ো মা বাবারা যেমন আশ্রয় চায় প্রশ্রয় চায়, আজকাল ছেলেরা তা দিতে পারছে না, পারছে মেয়েরা।

ঠিক বলেছেন, আজকাল ছেলেরা পারছে না, আগে কিন্তু পারতো। দীপকের ঘাড়ে তর্কের ভূত চেপেছে যেন, বলল, এর কারণ কী সেটা কখনো ভেবে দেখেছেন?

অত ভাবতে পারবো না।

কিন্তু কারণ ছাড়া তো কিছু হয় না।

কী কারণ?

এই বিষয়টা নিয়ে কখনো ভাবেনি দীপক নিজেও, কিন্তু অদ্ভুত ভাবে এক মুহূর্তে ঝরঝর করে বলার মত যুক্তি এসে গেল ওর মাথায়। বলল, আমি নিশ্চিত না, তবে আমার মনে হয় সারা পৃথিবী জুরে ওম্যান্স লিবারেশন এর কারণ।

মানে কী?

মানে আপনার মেয়ে আর ছেলের বৌরা চাকরি করে নিশ্চয়ই।

তা করে।

কিন্তু আপনি কোনদিন বাড়ির বাইরে যাননি কোন চাকরি টাকরি করতে।

আমাদের সময় এ রকম ছিল নাকি?

ছিল না, সেটাই তো বলছি। আপনাদের সময়ে বাড়ির বৌরা কেবল ঘর সামলেছে, রুজি রোজগার সব ছেলেদের। তাই তখন সমাজে মহিলারা ছিল মোটামুটি অবহেলার বস্তু, সংসারে ওদের মতামতের ছিল না কোন দাম।

তাছাড়া আবার কী, উনি দীপকের কথা মানলেন, কর্তা কোনদিন আমার কোন কথা পাতে তুলেছেন নাকি!

'কর্তা', হাসল দীপক। বলল, দেখুন আপনিই বললেন শব্দটা। তখন পুরুষই সংসারের কর্তা, তাদের কথাই শেষ রায়। ছেলেরা তখন মা বাবার জন্য করতে পারতো যা খুশি। আর ছেলের জোরে শ্বশুর শাশুড়ীরা তখন কত অত্যাচার করেছে ছেলের বৌদের উপর। আপনার অভিজ্ঞতা সম্ভবত ভিন্ন না।

দীপক ভাবল উনি কিছু বলবেন, কিন্তু উনি চুপ করেই রইলেন। ও আবার বলল, তারপর আপনার জীবদ্দশাতেই চাকা গেল ঘুরে, মেয়েরা লেগে গেল পড়াশুনায়, চাকরী বাকরিতে। মেয়েদের সম্মান করা সমাজে প্রথম প্রথম ফ্যাশান, তারপর রীতি হয়ে গেল, কারণ তারা ততদিনে সে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। সংসারে সংসারে তাদের মতই বহাল। আপনার মেয়ের সংসারে তার মতামত বড়, আপনার বৌমাদের মতামত তাদের সংসারে।

দীপক দেখতে পেল মহিলার চোখ ছলছল করছে। ওর কোন কথা নিশ্চয়ই আঘাত করেছে ওঁকে। তাড়াতাড়ি বলল, আমার কোন কথা যদি আপনাকে কষ্ট দিয়ে থাকে তাহলে আমি দুঃখিত। আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে আঘাত করতে আমি কিছু বলিনি। আপনার উদাহরণে আলোচনা করছিলাম একটা আধুনিক সামাজিক সমস্যার কথা, আর প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন আপনিই।

দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। সেটা মুছে নিয়ে উনি বললেন, তোমার কথার অনেকটাই ঠিক, তবে পুরোটা না। আজ মেয়েরা ঘরের বাইরে এসে সংসারের রুজি রোজগারের হিস্যা হয়ে থাকলেও, ছেলেদের রোজগার তো বন্ধ হয়ে যায়নি। আজকে মেয়েদের মতামত আর ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে না পারলেও, নিজেদের মতামত জলাঞ্জলি দিচ্ছে কেন ছেলেরা।

এই বক্তব্যটা অবশ্য বিবেচ্য, দীপকের ভাবনার গভীরে যুক্তিটা চলে গেল। দু দণ্ড ভেবে নিয়ে ও বলল, সব ছেলেরা নিজেদের মতামত জলাঞ্জলি দিচ্ছে কিনা আমি জানি না। আর এটাতো ঠিক, যখনই দুটো মতের মধ্যে বিরোধ হয়, তখন কোন একটাকে তো হারতেই হবে।

সেটাই তো বলছি, চোখমুখ মুছে এখন উনি পূর্ববৎ সংযত। বললেন, ছেলেরা হারটা মেনে নিচ্ছে ইচ্ছে করেই।

বলছেন?

বলছি, বলছি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। আজকের সংসারে মেয়েদের কথা খাটবার বড় কারণ মেয়েদের প্রতি ছেলেদের সম্মান দেখানো যতটা, তার থেকে বেশি ছেলেদের দায়িত্ব এড়াবার প্রবণতা। তোমরা ছেলেরা হচ্ছ মুখে মারিতং জগৎ, তোমাদের মুখের কথায় আর মনের ভিতরের ইচ্ছায় কোন যোগ থাকে না।

আপনার এমন মনে হয়?

হ্যাঁ হয়। এই যে তোমার ওপাশের লোকটি অত আগবাড়িয়ে বলল তোমাকে হেল্প করবে, প্রয়োজনে তাকে পাবে ভেবেছো?

দীপক সত্যি কিছু ভাবেনি এ নিয়ে, তবে বিবির কথাকে ফালতু ভাবারও কোন কারণ খুঁজে পেল না। বলল, আপনি অযথা ব্যানার্জীদাকে খারাপ ভেবে ফেলেছেন। সবাই তো, কি বলব . . . .

দীপক একটু ইতস্ততঃ করছিল যা বলতে যাচ্ছিল সেটা বলা ঠিক হবে কিনা ভেবে। মহিলা বললেন, বল, কি বলতে চাইছ। আজেবাজে কথা শোনা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

দীপক আর পারল না। বলল, সবাই তো আপনার ছেলেদের মত না ই হতে পারে। ব্যানার্জীদাকে অগ্রিম দোষারোপ করা আমি মেনে নিতে পারি না।

মহিলা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন দীপকের দিকে ঠায়। তারপর হাতব্যাগ খুলে এক টুকরো কাগজ বের করে তাতে কী লিখলেন খচ্‌খচ্‌ করে। কাগজটা দীপকের দিকে বাড়িয়ে ধরে থমথমে মুখে বললেন, তুমি দেখে নিও আমি যা বললাম সেটা অক্ষরে অক্ষরে মেলে কিনা। যদি এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোন উপকার পাও, তাহলে ফোন করে আমাকে কথা শুনিয়ো যত পার।

চিত্র পাশাপাশি

কোন প্রয়োজন হবে না এই টেলিফোন নাম্বারের। আর কোনদিন কোন আলোচনা দীপক করতে চায় না এই মহিলার সঙ্গে, তবুও হাত বাড়িয়ে কাগজের টুকরোটা নিয়েছিল। পাশাপাশি এটাও ভেবেছিল যে বিবির কাছ থেকে কোন সাহায্য চাইতেই বা হবে কেন। হীথরো এয়ারপোর্টে দীপকের এই ভাবনার উল্টোটাই বাস্তবে ঘটল ঘটনাক্রমে। আটলান্টায় পৌঁছে হাউসিং অফিসে গিয়ে দেখল ওর জন্য কোন অ্যাকোমোডেশন রাখা নেই। অ্যাডভান্স ডিপজিট জমা পড়েনি বলে হাউসিং অফিস কোন অ্যাকশন নেয়নি। মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়ার মত অবস্থা। প্রফেসর বেইটসের বাড়িতে থেকে পাগলের মত খোঁজাখুজি করে চার দিনের মাথায় একটা রুমিং হাউসে ঘর পাওয়া গেল, কিন্তু মাসের ভাড়া আশি ডলার অ্যাডভান্স দিতে হবে। ততদিনে পকেটের ষাট ডলারের মধ্যে অবশিষ্ট আছে পঁয়ত্রিশ ডলার। ইউনিভার্সিটি থেকে পাওয়া স্কলারশিপের টাকায় টুইশন জমা পড়েছে, আর অ্যাসিষ্ট্যান্টশিপের টাকা পাওয়া যাবে না প্রথম দু সপ্তাহ পার হবার আগে। ব্যতিব্যস্ত দীপক যখন টাকার চিন্তায় দিশেহারা, তখন ঝট করে মনে পড়ল বিবির কথা। দীপকের মনে হল এই জন্যেই ভগবান পথে ওর সঙ্গে বিবির দেখা করিয়ে দিয়েছিলেন। বিবির দেয়া কার্ডটা বের করে নাম্বারে ফোন করল দীপক। ওপাশে ফোন কেউ ধরল না, তবে ভয়েসমেল গ্রিটিংস থেকে বোঝা গেল এটা বিল ব্যানার্জীরই নাম্বার। দীপক ম্যাসেজ রাখল, ব্যানার্জীদা, আমি দীপক বলছি। কলকাতা থেকে লন্ডন ফ্লাইটে আপনার পাশের যাত্রী। নীড সিরিয়াস হেল্প। প্লিজ কল করবেন অ্যাজ সুন অ্যাজ ইউ ক্যান। আমার টেলিফোন নাম্বার . . . .।

একদিন দুদিন তিনদিন চলে গেল, দীপক কোন ফোন পেল না বিবির কাছ থেকে। এদিকে রুমিং হাউসের ল্যান্ডলেডি আলটিমেটাম দিয়ে দিয়েছেন, আগামী দুদিনের মধ্যে অ্যাডভান্স টাকা জমা না দিলে উনি অন্য আরেকজনকে ঘর দিয়ে দিতে বাধ্য হবেন। ভাবনা চিন্তায় ছটফট করতে করতে দীপক আবার টেলিফোন করল বিবিকে। আবার ভয়েসমেল, আবার মেসেজ রাখল দীপক। কিন্তু কোন উত্তর এল না। মড়িয়া হয়ে শেষপর্যন্ত দীপক প্রফেসর বেইটসের কাছে ধার চাইল, টাকা নিয়ে গিয়ে শেষ মুহূর্তে পেতে পারল ঘরটা। দু সপ্তাহের মাথায় অ্যাসিষ্ট্যান্টশিপের মাইনে পেয়ে প্রফেসর বেইটের ধার মিটিয়ে দিল।

আটলান্টায় পা দেবার পর থেকে দুঃস্বপ্নের মত ঘিরে থাকা বাসস্থানের সমস্যাটার সুরাহা হতে দীপক যেন দম ফেলতে পারল স্বাভাবিক ভাবে। তারপর নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশে নতুন সব সিষ্টেমে সরোগরো হতে হতে চলে গেল আরো দু তিন সপ্তাহ। মাস খানেকের মাথায় হঠাৎ একদিন দীপকের মনে পড়ল বিবির কথা, কই এতদিনেও তো তার কাছ থেকে কোন টেলিফোন এল না। এই ভাবনাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে দীপক পড়ে গেল সেই মহিলার মুখোমুখি। বুকের ভিতরে খচখচ্ করতে থাকে টেলিফোন নাম্বার লেখা কাগজের টুকরোটা। খুব মন খারপ করা পীড়ায় ভুগতে থাকল ও, কেন বিবি উপযাচক হয়ে এমন কথা দিলেন যা উনি রাখতে পারবেন না। দীপক তো সাহায্য চায়নি, তবুও তাৎক্ষণিক মহান হবার মোহে কেন বিবি এমন প্রতিশ্রুতি দিলেন, যা ওঁর মনের ইচ্ছা নয়। দীপকের কষ্ট হতে লাগল মেনে নিতে, ছেলেরা কী সত্যি তাহলে যা বলে তা মনের কথা না! তারা সব কী সত্যিই দায়িত্ব এড়ানো দলের হয়ে গেছে! এসব ভাবনায় যত দীপকের মনখারাপ হতে থাকল, তত ও এই মহিলাকে একটা ফোন করার দায় অনুভব করতে লাগল। উনি নাম্বার দিয়েছিলেন ওঁর ভবিষ্যৎ বাণী না ফললে ফোন করে কথা শোনাবার জন্য, কিন্তু এখন ওকে ফোনটা করতে হবে উল্টো তিরস্কার শোনার জন্য। দীপক যেন দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছে মহিলা কেমন চিবিয়ি চিবিয়ে ওকে দেবেন জীবনের জ্ঞান। এই জ্ঞান মেনে নিতে ওর কষ্ট হবে সহ্যাতীত, তবুও ফোনটা করতেই হবে, কতকটা যেন প্রায়শ্চিত্ত করার মত মহিলাকে খারাপ ভাববার জন্য। মানিব্যাগের খোপ থেকে ভাঁজ করা কাগজের টুকরোটা বের করল দীপক, ডায়াল করল নাম্বারটা। ফোনটা ধরল মনে হয় মহিলার জামাই, এবং পরিচয় দিতে বেগ পেতে হল বেশ একটু। অবশেষে ফোনে এলেন সেই মহিলা। জেনে গেছেন কে ফোন করেছে, তাই দীপক কোন কথা বলার আগেই বললেন, কথা শোনাবে তো?

দীপক হতচকিত হল কিছুটা। বলল, না, ঠিক তেমন না।

তা নইলে আর ফোন করেছো কেন? তবে কী জান, হাতের পাঁচটা আঙুল তো সমান হয় না, এই ভদ্রলোক হয়ত সত্যিই ভদ্রলোক।

নাআ, দীপক কঁকিয়ে উঠল, আপনার কথাই ঠিক হয়েছে। আটলান্টা পৌঁছে আমার দরকার পড়েছিল ওঁর সাহায্যের, তখন বিবির কাছে আমি দু দুবার মেসেজ রেখেছি হেল্প চেয়ে। সে আজ প্রায় এক মাসের উপর হয়ে গেল, আজও আমি বিবির কাছ থেকে কোন ফোন পাইনি।

ও পাশ থেকে উত্তর এল শুধু হুঁ, আর কোন কথা না। দীপক মেনে নিতে পারছে না এ নীরবতাও, প্রায়শ্চিত্ত যেন তাহলে হচ্ছে না। বলল, কিছু বলছেন না যে! যত তিরস্কার আমার প্রাপ্য সব শোনান।

হাল্কা একটা শ্বাস ফেলার শব্দ। বললেন, কী হবে তা শুনিয়ে? তাতে জগৎ সংসারের এই অধোঃগামী ধারায় আঁচড় পড়বে কতটা?

তবুও, বলুন যা খুশি। মনে মনে আমি আপনাকে খারাপ ভেবেছিলাম, সে জন্যে তিরস্কার আমার প্রাপ্য।

সামান্য হাসির প্রলেপ যেন। বললেন, তুমি ছেলেটি ভিন্ন ধরনের আছো, তোমার তর্কের তীব্রতায় সেদিনও এটা মনে হয়েছিল আমার।

আমি ভিন্ন কিনা জানি না, দীপক আস্তে আস্তে বলল, তবে বিধ্বস্ত বটেই। আপনার কথা বিবির ক্ষেত্রে মিলে গেল, এটা আমাকে ডিষ্টার্ভ করছে ভীষণ, কিন্তু সত্যকে তো অস্বীকার করা যাবে না। আমি মানতে পারছি না।

আমি যা বলেছি সেটা আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মহিলা আস্তে আস্তে বললেন, পৃথিবীর সবার জন্য তো সেটা ধ্রুব না ই হতে পারে।

না না, আজ আপনি আমাকে প্রবোধ দেবেন না . . . .

অন্য আরেকটা ফোন এসেছে, কল ওয়েটিং সেটা জানাচ্ছে বীপ করে। কিন্তু দীপক এখন এই ফোনটা কাটতে পারবে না। এখন অজস্র তিরস্কার না শুনলে যেন ওর চলবে না। আজ ওর প্রহার চাই, প্রহার।

না না, প্রবোধ দেবার কী আছে, দীপকের ক্ষণিকের নীরবতায় ওপাশ থেকে মহিলা বললেন, এই যে মানতে পারছো না, এটাই আসল।

কেন?

তোমার যদি বিবেক না থাকত, তাহলে তুমি সেদিন আমার সঙ্গে অত তর্ক করতে না। যদি তোমার বিবেক তোমাকে তাড়না না করত, তাহলে তুমি আজ ফোন করতে না, বিশেষ করে ওই ভদ্রলোক যা করেছেন তারপর।

কী প্রয়োজন ছিল বিবির আমাকে মিছে ভরসা দেবার? আমি তো কিছু চাইনি।

তুমি এমন নও, এটাই আমার ধারণা হচ্ছে, এটাই আমার কাছে বড়।

দীপক চুপ করেই রইল। মহিলা আবার বললেন, দীপক, তোমার সঙ্গে সেদিনের তর্কে আমিও আমার বিবেক ফিরে পেয়েছি।

মানে? দীপক বুঝতে পারে না।

উনি নির্দ্বিধায় বললেন, আমি আমার মেয়ে জামাইকে বলেছি যদি বেয়ানকে না নিয়ে আসে, আমি একা এখানে আর থাকব না।

বিবেকের হদিশ

আরো কিছু কথার পর দীপক ফোন রেখে দিল। এই মহিলা যেন ফ্লাইটে দেখা সে মহিলা না। বিবেক নিয়ে এমন কথা তো সেদিন তাঁর মুখে ছিল না। দীপক বুঝতে পারল যুক্তি তর্কের মধ্যে দিয়ে পরিমার্জিত হয় মানুষের বোধ বুদ্ধি। ফোনটা ছাড়তে দীপক খেয়াল করল ওর মেসেজ বক্সে একটা মেসেজ ব্লিংক করছে। মহিলার সঙ্গে ফোনটা চলাকালিন অন্য যে ফোনটা এসেছিল সে মেসেজ রেখেছে মনে হয়। দীপক বাটনটা টিপল মেসেজ চেক করতে। স্পিকারে বেজে উঠল, "বিবি বলছি দীপক। এখানে ছিলাম না, ফিরে এসে তোমার মেসেজ পেলাম। তোমার নাম্বার বিঝি পাচ্ছি, কল কোরো।"

বিবির মেসেজ! ঝট করে দীপকের বুকে একটা ধাক্কা লাগল। এই একটুক্ষণ আগে মহিলার কাছে ও বিবির বেশ নিন্দা করেছে। যখন এসব কথা হচ্ছিল তখনি ফোনটা এসেছিল! অদ্ভুত লাগে এই যোগাযোগটা। ফোন তুলে বিবির নাম্বার ডায়াল করল দীপক। ওপাশ থেকে উত্তর এল, বিবি হিয়ার।

আমি দীপক বলছি ব্যানার্জীদা।

দীপক, এই তো তুমি, তোমার ফোন বিঝি ছিল।

হ্যাঁ, একটা ফোনে ছিলাম। মাঝে কল ওয়েটিং চেক করিনি, পাছে ফোনটা কেটে যায়।

না না, এমন হবে কেন। তো বল, তোমার কী হেল্প দরকার বলে ফোন করেছিলে। তোমার দেয়া নাম্বারটা তোমার প্রোফেসরের বাড়ির ছিল, সেখানে কল করে তোমার এই কারন্টে নাম্বার পেয়েছি। আমি তো এখানে ছিলাম না, ইট মে নাউ বী লেইট ফর হোয়াট হেল্প ইউ নীডেড। কী হেল্প বল।

ঠিক বলেছেন, যে কারণে ফোন করেছিলাম সেটা মিটে গেছে।

স্যরি দীপক, কুড্‌ন্ট বী অভ হেল্‌প হোয়েন ইউ নীডেড। বাট আই হ্যাড টু রাস ব্যাক টু ক্যালকাটা।

রাস ব্যাক! দীপকের চমক লাগল। জিজ্ঞাসা করল, কেন, কী হয়েছে ব্যানার্জীদা?

আমার মার শরীর খারাপের খবর এসেছিল, শী হ্যাড আ্য স্ট্রৌক।

আবার একটা ধাক্কা লাগল দীপকের বুকে। বলল, আই এম স্যরি ব্যানার্জীদা, মাসীমার কথা শুনে খুব খারাপ লাগছে। কেমন আছেন এখন?

ভাল, এখন অনেক ভাল। সঙ্গে সঙ্গে কোঠারী নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মা গট এক্সেলেন্ট ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড কেয়ার। শী ইজ আউট অভ ডেঞ্জার নাউ। বাড়িতে রিকভার করছে এখন।

ভাল।

আর হ্যাঁ, তোমার বৌদির ভিসাও হয়ে গেছে ইন দ্য মীন টাইম।

সে তো আরো ভাল খবর, দীপক আনন্দের সুরে বলল, নিয়ে এসেছেন বৌদিকে এবার?

না।

কেন? নিয়ে এলেন না কেন?

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন বিবি। তারপর বললেন, আমার অসুস্থ মাকে এই অবস্থায় ফেলে ওকে কী করে নিয়ে আসি বল?

তা ও ঠিক।

না, আমি রুমার কথা মানতে পারিনি দীপক। ও বলছিল কোনো নার্সের ব্যবস্থা করে তার কেয়ারে মাকে রেখে ওকে সঙ্গে নিয়ে আসতে।

ও।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিবি বললেন, দীপক, কম বয়সে আমি অনেকদিন আমার মাকে অবহেলা করেছি। দেরী করে হলেও, বুঝতে যখন পেরেছি তখন আর এ ভুল করতে পারব না।

কিন্তু বৌদিকে জোর করে এভাবে কলকাতায় রেখে কি কোন লাভ হবে?

না হবে না, আমি ভাল করেই সেটা বুঝি। মাকে আমার কাছেই নিয়ে আসতে হবে।

ঠিক বলেছেন, সেটাই হবে বেষ্ট।

তুমি বলছো বটে দীপক, প্রবলেম আছে সেটাতেও।

কী প্রবলেম?

তোমার কথা ঠিক হল না দীপক।

আমার কথা? আমার কোন কথা?

তুমি বলেছিলে না এবার আমার আর কোন ঝামেলা হবে না।

হ্যাঁ, বলেছিলাম।

সেটা হল না দীপক, গাঢ় একটা শ্বাস পড়ল বিবির। বললেন, রুমা চায় না আমি মাকে আমার কাছে এখানে নিয়ে আসি। আমার জীবনে ঝামেলার শেষ আর হল না।

আরো কিছু কথার পর ভবিষ্যতে কোন দরকার পড়লে যোগাযোগ করবার কথা বলে ফোন রেখে দিল বিবি। দীপকের মনটা খারাপ হয়ে গেল খুব। অস্থির একটা অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগল নিজের মনে। এই যে এই মহিলার ছেলেদের ব্যবহার থেকে হওয়া ধারণা বিবি ক্ষেত্রে মিলল না, এটাতে যেটুকু স্বস্তি পাওয়া গেল তার অনেকগুণ বেশি অশান্তি এসে গেল বিবির বৌয়ের কথায়। কেন এমন হয়? কেন এমন দুজন মানুষ, যারা জীবনের সব সুখ দুঃখ একসঙ্গে নেবার অঙ্গীকারবদ্ধ, তারা একজন অন্যজনকে এমন সমস্যায় ফেলে? কেন? কেন ঈশ্বরের এই জগতমঞ্চে ক্রীড়নক মনুষ্যের জীবন নাটকের ভূমিকা পালনে মিশে আছে বিবেকের সঙ্গে স্বার্থের যুদ্ধ, দায়িত্বের সঙ্গে কর্তব্যের সংঘাত, আর অনুভবের সঙ্গে অবহেলার বিরোধ? কেন সমাজের এই মহাযজ্ঞে মানুষের দিনগত ভাগ্যমত জীবন ধারনে অহরহ চলছে এই কষ্টের প্রবাহ? কেন? প্রশ্নটা দপদপ করে বাজে বুকের ভিতরে, কিন্তু কোন উত্তর কি উপায় খুঁজে পায় না দীপক। অসহায় দুঃখ ভারাক্রান্ত মনটা একাগ্র হয়ে যায় তীব্র প্রার্থনায় - হে ঈশ্বর, মানুষের মনে বিবেক যদি দিতে পারো, তবে সেই সঙ্গে দাও সেটার হদিশে স্থির থাকবার প্রবৃত্তিও।

লরেল, ম্যারীল্যান্ড
জুলাই ২৭, ২০০৫ ইং